Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.17-21
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মানবতা, বৌদ্ধ ধর্ম ও আম্বেদকর: একটি বিশ্লেষণ

ড. কল্যাণ ব্যানার্জী
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল, পশ্চিম বঙ্গ

Abstract

It is needless to say that, the Philosophy of Gautama Buddha and Dr B.R. Ambedkar is the burning example to establish humanism as the basic identity of the human being. We can see that in any religion humanism gets the first priority as the basic identity of the human being. Gautama Buddha and Dr B.R. Ambedkar, both the Philosophers of two different eras put much emphasis to construct some procedures by which human being can be completely released from religious struggles. The main objective of the both Philosophers is to humanize the human being. We may say Philosophy of Buddha and Ambedkar is a process of humanization of the human being. In this regard it can be said that, Dr B.R. Ambedkar has established the ethical standpoint of Gautama Buddha regarding humanism through constitutional rules and regulations. This paper mainly focused on this discussion regarding Humanism in the light of the Philosophy of Gautama Buddha and Dr B.R. Ambedkar.

মানুষ মানবিক উপাদান নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে এটাই স্বাভাবিক, তবে মানুষকে কখনোই পাশবিকতা গ্রাস করেনা এমন নয়। এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, মানুষকে পশুর পাশবিকতা গ্রাস করেনা বরং মানুষই তার স্বকীয়তা পরিত্যাগ করে নিজেকে পাশবিক করে তোলে। সে ভুলে যায় যে, সে মানুষ, মানবিকতা তার প্রধান আশ্রয়। আসলে মানবিকতা কোনও চাদরের মত আবরণ নয়, যা যখন খুশি গায়ে জড়ানো যায় আবার খুলেও ফেলা যায়। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে এটা প্রতিষ্ঠিত যে, আত্মবিস্মৃত হওয়া মানবজাতির এক স্বাভাবিক ধর্ম, যার ফলে মানুষ মাঝে মাঝে নিজ ঐতিহ্য ভুলে মানবিকতাকে গায়ের চাদরের মতো ব্যাবহার করে এবং নর-পশু হয়ে ওঠে। তখন মানুষ যে শুধু মনুষ্যেতর প্রাণীকে শোষণ করে, অত্যাচার করে এমন নয়, মানুষের দ্বারা মানুষও শোষিত, নিপীড়িত হতে থাকে। মানুষ তার নিজের তৈরি করা নৈতিক ও মানবিক বিধি-নিষেধের গুলিকে না-দেখার ভান করে, একথাও বলা যেতে পারে উপেক্ষা করে। এমতাবস্থায় সে বুঝতে অক্ষম হয় যে, তার দ্বারা অন্য মানুষের শোষণ আসলে স্ব-শোষণ। এই ভাবে ধীরে ধীরে সে নিজের কবর নিজেই খুঁড়তে থাকে। মানুষ উচ্চ, নীচ, বর্ণ-জাত-পাত প্রভৃতি সীমারেখার দ্বারা নিজেকে এবং অন্যকে সীমায়ীত করতে থাকে, ফলতঃ নিজের দ্বারাই নিজেকে সীমায়িত করে এবং পশুর পাশবিকতার কাছে হার মানতে বাধ্য হয় বা বশ্যতা স্বীকার করে। অন্যকে নিপীড়ন করে উল্লাস করে, অন্যের উন্নতিতে বাধা দিয়ে নিজে সুখী হওয়ার চেষ্টা করে। ফলতঃ মানবিকতার সম্মুখে এক অমানবিক চেহারা উপস্থাপন করে পশু সদৃশ মানুষ (যাকে গোদা বাংলায় অমানুষ বলে) হয়ে একদিন পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেয়, নন্দিত হওয়ার বদলে নিন্দিত হয়। এরই পাশাপাশি আর এক রকম চিত্রও আমাদের সামনে প্রতিভাসিত হয় বা হতে দেখা যায়, যেখানে মানুষ নিজের সমগ্র জীবন অন্যের জন্য নিবেদন করছেন নিঃস্বার্থ ভাবে, শুধু মানবতা প্রতিষ্টার লক্ষ্যকে সামনে রেখে। মানবসেবাকে পাথেয় করে সর্বোতভাবে অন্যের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন এক পরম আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। দর্শন চিন্তার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে উক্ত ভাবনার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় অনেক দর্শন সম্প্রদায় বা দার্শনিকের দার্শনিক উপলব্ধির মধ্যে। গৌতম বুদ্ধ ও আম্বেদকর দুই যুগের এই দুজন দার্শনিক সর্বোতভাবে অন্যের কল্যাণে

নিজেকে নিয়োজিত করে দর্শন চিন্তার এক নতুন দিক উন্মোচন করেছেন, মানবতার এক সুউচ্চ আদর্শকে পাথেয় করে এক পরম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই প্রবন্ধ মুখ্যত গৌতম বুদ্ধ ও আম্বেদকরের দর্শন যে প্রকৃতপক্ষে মানবিকিকরণের (Humanization) এক পূর্ণাঙ্গ দলিল সেকথাই প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস মাত্র।

মানবতা ও মানবসেবা একার্থক নয়। মানবসেবার মধ্যে পরোপকার জাতীয় এক প্রকার অনুভূতির জন্ম হয়, সেক্ষেত্রে স্বজ্ঞানে বা নির্জ্ঞানমনে বিশেষ অহং-এর উদ্রেক হয়। তবে মানবসেবা মানবিক হতে পারে, যখন মানুষ অন্যের সেবা করে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিকে উপেক্ষা করে, নিঃস্বার্থ ভাবে অন্যের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে সেবা ও মানবিকতার আদর্শের মিলনকে সার্থক করে তোলে। মানবসেবায় নিযুক্ত অনেকে মহত্বের উপাধীতে ভূষিত হন, কিন্তু তাতে তাঁরা মনুষ্যত্বে বা মহামানবত্বে তিনি কতটা উত্তীর্ন হতে পেরেছেন সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। মানুষের মানবিক উৎকর্ষতা নির্ধারিত হয় জগতে বিরাজমান সমস্ত জীবের প্রতি আচরণের নিরিখে। মানবতা এমন কোন মতবাদ নয় যেটিকে তৈরী করতে হয়েছে বা এমনও নয় যে, কোন অন্য মতকে খণ্ডন, মণ্ডন করে এই মত কে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। মানুষের নৈতিকতা, দায়দায়িত্ব, কর্তব্যপরায়নতার বহিঃপ্রকাশ হয় এই মহান আদর্শের মধ্যদিয়ে। একথা বলাই যায় যে মানবতা কোন মতবাদ নয় একটি আদর্শ। বিশ্বে যে সকল মতবাদ প্রচলিত তার সঙ্গে এই আদর্শের পার্থক্য হলো এই আদর্শের কোনও প্রবর্তক নেই। যদিও একেবারেই নেই এমন বলা চলে না। বিভিন্ন মতবাদের পিছনে নির্দিষ্ট এক বা একাধিক ব্যক্তি বা মহামানব থাকেন যাঁদেরকে ঐ মতবাদের প্রবর্তক বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু এমন কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে পাওয়া যায়না যাদেরকে মানবতার প্রবর্তক বলা যায়, সেদিক থেকে এই মতবাদ প্রবর্তক শূন্য। কিন্তু আবার একথাও ঠিক যে, সকল সহৃদয় ও মনুষ্যত্ব সম্পন্ন মানবপ্রেমী ব্যক্তিই এই মতবাদের প্রবর্তক। আমরা আমাদের প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞার দ্বারা মানবতার এই আদর্শের মূল্য অনুধাবন করি।

ইংরেজী শব্দ 'Humanism'—এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'মানবতাবাদ' শব্দটি ব্যাবহৃত হয়ে থাকে, যা সর্বোত ভাবে মানব কেন্দ্রিক। মানুষের ওপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও আস্থা মানবতাবাদের অন্যতম অনুমাপক। তবে বর্তমান বিশ্বে মনবতা ধ্বংসের নজির কিছু কম নয়, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষের দ্বারাই মানবতাবাদকে ধ্বংস করার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। মানুষ ছাড়া পশু-পাখি বা প্রকৃতি মানবতা ধ্বংসের জন্য কোন প্রচেষ্টা করছে এমন দৃশ্য বিরল। মানবতা নামক এই মহান আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করাই হোক আর তাকে ধ্বংস করাই হোক দুটিই একমাত্র মানুষের দ্বারাই সম্ভব।[১] মানুষ যখন আত্মচৈতন্য উপলব্ধ হয়ে মানব জাতির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে তখন তিনি মানবতাবাদী। নিজ প্রাণপাত করে নিজেকে মানব জাতির সেবায় নিয়োজিত করেছেন এমন মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসে কম নয়। কিছু কিছু ঘটনা যুগ যুগ ধরে বয়ে চলা গড়পড়তা জীবনের ঘটনাবলীকে অতিক্রম করে সামাজিক চেতনায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত করে। তখন জগৎ মানব জাতির কাছে সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। পৃথিবীর বুকে এই সকল ঘটনা সমাজ তথা মানব জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সঠিক দিশা দেখায়। এমনই একটি ঘটনা হল পৃথিবীতে বুদ্ধের আবির্ভাব। গৌতমবুদ্ধ হলেন এমনই এক প্রাণপুরুষ যাঁর বানী সকল বিধিনিষেধের নিয়ন্ত্রন তথা গণ্ডীকে অতিক্রম করে সুদূরপ্রসারী এক বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। পৃথিবী এমন একজন মানুষকে পেয়েছিল যাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে অন্যান্য মানুষের জীবনও প্রভূত অর্থপূর্ণ ও তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছিল। গৌতমবুদ্ধ মানুষের হিতার্থে মানুষের বৌদ্ধিক বিচার ক্ষমতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন সমাজে প্রচলিত মতগুলির বিপরীতে গিয়ে। একথা আমাদের সকলেরই জানা যে, মানবতার স্বার্থে তথাকথিত বেদের বিধানকেও অস্বীকার করতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেননি। মানবতাকে আরও বৃহত্তর আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, মানব জাতির মুক্তির লক্ষ্যে নিয়োজিত এমন প্রাণপুরুষ হলেন গৌতমবুদ্ধ। তাঁর চেতনায় ধরা পরেছিল এক বিরাট সত্য— এই মানবজাতি দুঃখ দুর্দশাগ্রস্থ, ক্লিষ্ট ক্লান্ত। মানুষ আপন সুখের সন্ধানে ক্রমান্বয়ে দুঃখকে আরও তীব্র করে তোলে। এই বোধ মানব জাতির মধ্যে জাগ্রত করার লক্ষ্যে এবং কিভাবে এই দুঃখের হাত থেকে চিরমুক্তি সম্ভব তার যথাযথ পথ প্রদর্শনের জন্যই গৌতমবুদ্ধ ও তাঁর ধর্ম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।[২]

বুদ্ধদেবের আর্বিভাবকালে নানা ধর্মমত প্রচলিত ছিল, তবে সেগুলি তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। ধর্মের আচার অনুষ্ঠান, ধর্মের উৎসব সিদ্ধার্থের রাজ্যে আড়ম্বরের সাথে উদযাপিত হত৷ বেদজ্ঞ ঋষিদের আনাগোনা, দেবতাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন, ভগবানকে তুষ্ট করার প্রয়াস সবই নিয়মিত রূপেই আচরিত হত৷ কিন্তু বুদ্ধদেবের ধর্ম সম্পর্কে বিশ্লেষণ বা মূল্যায়ণ উক্ত ধর্মের আচরণের সঙ্গে খাপ খায়নি। খাপ না খাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় তথাকথিত ধর্মের প্রতি বুদ্ধদেবের আকর্ষণহীনতা বা আনীহা। বুদ্ধদেব ছেয়েছিলেন নৈতিক নিয়ম-রীতি, শৃঙ্খলা ও চরিত্র অনুযায়ী মানবতার অনুশীলন। ধ্যান, গভীর তপস্যা, কঠোর সাধনা, কৃচ্ছসাধন এগুলি যেকোন ধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বুদ্ধদেব যে

ধর্মের পত্তন করেন সেই ধর্মে ধ্যান, তপস্যা, কৃচ্ছসাধন নেই তা নয়, তবে এগুলির ভিত্তি নরকের আগুনের ভয় বা স্বর্গলাভের লোভ নয়, বুদ্ধদেবের ধর্মে ধ্যান তপস্যা কৃচ্ছসাধনের ভিত্তি হল নৈতিক নিয়ম-নীতি, শৃঙ্খলা ও চরিত্র গঠনের মাধ্যমে দুঃখ দুর্দশাগ্রস্থ মানুষকে দুঃখের হাত থেকে চির মুক্তির পথ অনুসন্ধান।

অযৌক্তিক ধর্মাচারণ বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মে স্থান পায়নি বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী যা বুদ্ধবাণী নামে অভিহিত হয় তা এক গভীর যুক্তিবাদের সমষ্টি। মানব কেন্দ্রিক বৌদ্ধ ধর্মে মানব মুক্তির প্রধান অন্তরায় রূপে অবিদ্যাকেই দায়ী করা হয়েছে। ঐ অবিদ্যা হল জ্ঞানের অভাব। যে জ্ঞান মানব মুক্তির সোপান হতে পারে, তা কোন তত্ত্বকথা নয়, এক গভীর জীবন বোধের দ্বারা উপলব্ধ আত্মপ্রত্যায় যার ভিত্তি হল সঠিক মূল্যায়ণ, নৈতিক শুদ্ধতা ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতা। সরল বিশ্বাস, অজ্ঞতা বা অন্ধবিশ্বাস যা প্রকৃত জ্ঞানকে এক বিশেষ আবরণে আবৃত করে রাখে, একমাত্র সঠিক মূল্যায়ণের মাধ্যমে যুক্তিবোধের উপর ভর করে মানব মুক্তির পথকে প্রশস্ত করতে পারে। অনান্য ধর্মে এই মূল্যায়ণ ও যুক্তিবোধের অভাব হেতু ধর্ম- ধর্মমতে পরিণত হচ্ছে ও ধর্ম ভয়ে ভীত মানুষ - এটা বিধি, এটা নিষেধ, এটা উচিত, ওটা অনুচিত এই সকল ধর্মীয় অনুশাসন বা শৃংখলে বিদ্ধ হয়ে মুক্তির পরিবর্তে বদ্ধদশা প্রাপ্ত হচ্ছে।

গৌতমবুদ্ধের দ্বারা প্রবর্তিত দর্শনের লক্ষ্য কোনও তত্ত্বকথা প্রতিষ্ঠা নয়, বরং মানুষের মুক্তির পথ অনুসন্ধান করা। কিভাবে সকল মানুষকে এক ছত্রে বেঁধে দান, সেবা ও করুণার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা যায় তার জ্বলন্ত দলিল গৌতমবুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। গৌতমবুদ্ধ ভগবান নন, তিনি দুঃখ দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের দুঃখের হাত থেকে চির মুক্তির পথপ্রদর্শক। একজন আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতা সম্পন্ন দিশা নির্দেশক।[৩] মানুষে মানুষে বৈষম্য বা বিভাজন নয় বরং সমগ্র মানব জাতির দুঃখ-দুর্দশা মুক্তির সোপান হল বৌদ্ধদর্শন তথা বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জীবের মুক্তিই প্রধান লক্ষ্য। তাঁর প্রচারিত ধর্ম ও দর্শন ভাবনায় অদৃষ্টের কোনও স্থান নেই। তাঁর মতে জীবের মুক্তি লাভের জন্য জীব নিজেই যথেষ্ট। সহজ ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের মূল বিন্দুতে রয়েছে মানুষ ও মানুষের কল্যাণ সাধন, কোনও অতিপ্রাকৃত সত্তার আরাধনা এর জন্য অপ্রয়োজনীয়।

বুদ্ধদেব যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক সেই ধর্মে এমন কোন নীতিকথা উপদেশ নেই যা ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন। এক অভিন্ন অখণ্ড নীতি যা ধনী-দরিদ্র, আর্ত-পীড়িত, মূর্খ-শিক্ষিত সকলের জন্য সমান। তিনি তাঁর ধর্মের মধ্যে এমন কোন ধর্মীয় উপদেশ দেননি যেটি শুধুমাত্র ব্রহ্মণের জন্য বা শুধুমাত্র ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা শূদ্রের জন্য। বর্ণভেদ-জাতিভেদ ইতাদি বৈষম্য বা অসাম্য কোন ভাবেই বৌদ্ধধর্মে স্থান পায়নি। পীড়ন, বিধিনিষেধ বা কোন না-বাচক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন নেই বৌদ্ধধর্মে। বৌদ্ধধর্ম স্বর্গ-নরকের সুখ ও ভীতি না দেখিয়ে প্রকৃতই নৈতিক আচরণে উৎসাহিত করে। একদিকে বৌদ্ধ দর্শন যেমন বিশুদ্ধ আচার-আচরণের ওপর জোর দিয়েছে, তেমনি আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসাকে গৌণ স্থান দেওয়া হয়েছে।[৪] তিনি মনে করতেন সঠিক নীতিমালার মাধ্যমে মানুষের চিন্তাধারাকে দিক নির্দেশনার জন্য ও পরিচালনার জন্য ধর্ম একান্ত প্রয়োজন। বলা যেতে পারে বুদ্ধদেবের ভাবনায় আধ্যাত্মিকতা বা আবেগের পরিবর্তে নৈতিকতা ও যুক্তিবোধ ধর্মের ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে তা প্রকৃত মানব ধর্ম হিসেবে গণ্য হয়। মানব ধর্ম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বুদ্ধদেব কোন প্রাতিষ্ঠানিকতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে যে ধর্ম প্রবর্তন করেন তার মূল লক্ষ্য ছিল মুক্তি, বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি। একারণেই আমরা বলতে পারি বৌদ্ধ ধর্ম হল মানব জাতির মুক্তির ধর্ম। বুদ্ধদেবের কাছে বন্ধন হল অবিদ্যা বা প্রকৃত বিদ্যার অভাব।[৫] মানুষ অবিদ্যাবশতঃ দুঃখ-দুর্দশায় জড়ায়, অন্য কথায় দুঃখ ভোগ করে। তবে তিনি এই দুঃখের হাত থেকে মুক্তির পথ হিসেবে বেশ কয়েকটি পথ বা মার্গের সন্ধান দিয়েছেন যার মূলে ছিল অহিংসা ও সংযম। যেগুলিকে দার্শনিক পরিভাষায় বলে অষ্টাঙ্গিক মার্গ।[৬] অষ্টাঙ্গিক মার্গ কোন চাপিয়ে দেওয়া ধর্মীয় উপদেশ নয়। সুস্থ সুন্দর ও সার্বিক মঙ্গল সাধক একটি পথ যে পথ যেকোন মুক্তিকামী মানুষের জন্য সমান ভাবে গ্রহণীয়। সত্য কথা বলা, সদাচার পালন করা, অহিংসার পথ অবলম্বন করা, সর্বোপরি নারী-পুরুষ, উচ্চ-নীচ, জাত-পাত বর্ণ ভেদাভেদের উর্ধ্বে উঠে সমগ্র মানব জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করার একটি সম্পূর্ণ মানব ধর্ম, যা তৎকালীন সময় থেকে আজ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে চলেছে বৌদ্ধধর্ম।

বাবাসাহেব আম্বেদকর এই মানব ধর্মেরই পূজারী ছিলেন। যিনি তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ লক্ষ্য হিসেবে এই মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠার কথাই বলেছেন। আর সেকারণেই হয়তো বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কথা ভেবেছিলেন। আম্বেদকর সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চেয়েছিলেন এবং সেই পরিবর্তনের ভিত্তি হল সাম্য বা বৈষম্যহীনতা। একটি অবিশ্রান্ত লড়াই ও সমাজ বদলের ভাবনা— এসবই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান অঙ্গ। তিনি যে সকল সমস্যাকে দেশের উন্নতির, অগ্রগতির পথে

বাধা বলে মনে করেছেন, সেই সমস্ত বাধার মূল কারণ কি তা বিশ্লেষণ করে তাঁর সমালোচনাও করেছেন। সমাজে প্রচলিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারণের ইতিহাস বেশ প্রাচীন হলেও যার হাত ধরে বর্ণ ব্যবস্থার বিলোপ আইনসিদ্ধ হয় তিনি হলেন আম্বেদকর। মানুষে মানুষে ভেদ কোন সমাজকে অসুস্থ করতে বেশী সময় নেয় না, একথা বুঝতে তার বেশী দেরী হয় নি। একথা বললে অত্যুক্তি হয়না যে, ধর্মের দোহায় দিয়ে জাতিভেদ প্রথার পত্তন ভারতের ইতিহাসে একটি যে অধ্যায়ের সূচনা করেছিল আর সেই অধ্যায়টির ইতি টানেন আম্বেদকর। মানব জাতি, মানব ধর্ম, মানবতা এই শব্দগুলি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় বড্ড বেমানান, আম্বেদকরের উপলব্ধিতে যখন এই সত্যটি ধরা পড়ে তখন তিনি আর দেরি করেননি, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করে সাংবিধানিক স্তরে আইন প্রনয়ণের মাধ্যমে এক শ্রেণীহীন আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার পত্তন করেন। যে বর্ণব্যব্যস্থা একজনের জন্য পড়াশোনার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে অন্যজনকে অশিক্ষিত রেখে এই ব্যবস্থা যে সমাজকে আরও পিছনের দিকে নিয়ে যাবে তা তিনি জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। মানুষ হিসেবে সকলে সমান, মানবিকতা বা মানবধর্ম তাই বলে। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যদি কোন ধর্মের উপদেশ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করে তাহলে সেই ধর্মের উপদেশ পরিত্যাজ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। কেননা সেই ধর্মের উপদেশ মানবতার পক্ষে নয় বা মানুষের ধর্ম নয়, সে ধর্ম জাতি বা বর্ণের ধর্ম। জাতি-বর্ণের ভিত্তিতে উচ্চ-নীচ ভাবনা যে মানবতার পক্ষে হানিকারক সে কথা বুঝতে তার দেরি হয়নি। এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, মনুস্মৃতি পোড়ানো, হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ হয়তো তাঁর এই সকল উপলব্ধিরই প্রতিফলন।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর তার মাষ্টারমশাইয়ের কাছে থেকে যে বই টি তিনি উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন হয়তো সেটিই তাঁর ধর্ম পরিবর্তনের পথ অনেকটা সুগম করেছিল। সেই বইটি ছিল গৌতমবুদ্ধ ও বৌদ্ধদর্শনের উপর লেখা একটি বই। গৌতমবুদ্ধকে তখন থেকেই তিনি দান, সেবা ও করুণার প্রতীক এবং নিজের জীবনের পথপ্রদর্শক বলে মেনে নিয়েছিলেন। কখনই গৌতমবুদ্ধকে তিনি ভগবান হিসেবে দেখেননি, দেখেছিলেন নৈতিক শিক্ষক হিসেবে। গৌতমবুদ্ধের দার্শনিক উপলব্ধিতে অগাধ আস্থা ছিল আম্বেদকরের। আর এর কারণ একটাই জাত-পাত হীন, নারী-পুরুষ ভেদাভেদ হীন, উচ্চ-নীচের বৈষম্য হীন, কঠোর বর্ণিয় অনুশাসন ও বিধিনিষেধ হীন এক মানব ধর্মের বোধ, এর একটি রূপই হল বৌদ্ধ ধর্ম, যার কেন্দ্রে ছিল মানুষ। তিনি মনে করতেন মানুষ এক বিরাট সম্ভাবনাময় সত্তা, সে যে নিজেই সমস্ত কিছু করার অধিকার রাখে একথা সম্ভবত সর্বপ্রথম বুদ্ধদেবই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। গৌতম বুদ্ধের বানী তথা জীবনী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আম্বেদকর সেই পথের পথিক হয়েছিলেন। নিজের কথা না ভেবে যুগ যুগ ধরে শোষিত ও দলিত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য আম্বেদকর আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। এই সমস্ত মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিরলস প্রয়াস করে গেছেন। অস্পৃশ্য দলিত সমাজের ত্রাতা হিসাবেই আম্বেদকর ক্রমশ বৌদ্ধ ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েন। পৃথিবীর বুকে বুদ্ধের আবির্ভাব এবং বৌদ্ধ ধর্মকে এক ধর্মীয় বিপ্লবের পরিবর্তে মহান বিপ্লবের মতো মান্যতা দিয়েছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আম্বেদকরের এই শ্রদ্ধা ও অনুরাগের অন্তরালে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও ভারতে দলিত সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণ অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।

যতগুলি ধর্ম এখনও প্রাতিষ্ঠানিকতার নিরিখে ধর্ম বলে বিবেচিত হয় বা প্রচারিত হয় তার প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যই হল নিজ নিজ আদর্শের ভিত্তিতে মানব জাতিকে ধারণ করা। ধর্ম শব্দটির মধ্যে ধারণ করা নামক বিশেষ বৈশিষ্টের মূল প্রত্যয়টি নিহিত আছে সে কারণেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলি মানব জাতিকে ধারণ করে এমন নয়। সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রচারকই হন বা যীশু, বুদ্ধদেব বা মহম্মদ—এর মতো ধর্মপ্রবর্তকগণই হন প্রত্যেকরই মূল লক্ষ্য হল মানব সেবা, মানব কল্যাণ বা মানবোন্নয়নের রূপরেখা তৈরী করা। যুগে যুগে সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানিক ধর্মগুলি বিশ্লেষিত হয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তীত হয়েছে। ধর্মও স্থবির হয়ে যায়নি তাকে ধারণ করা বা রক্ষা করা বা অন্যভাবে বলা যায় শৃঙ্খলিত করতে ধর্মগুলিকেও নদীর মতো বইতে হয়েছে বা বয়ে চলেছে। আবার একথাও বলা চলে যে, মূল্যায়নের আলোকে ধর্ম কখনও শুধুমাত্র ধর্মমতে পর্যবসিত হয়েছে। উপবাস, উৎসব, যাগযজ্ঞাদির দ্বারা অভিষ্ট প্রাপ্তি এসব বৈশিষ্ট্যগুলি ধর্মকে কখনও ধর্মমতে পর্যবসিত করেছে। বেড়েছে একই ধর্মের মধ্যে বিভাজন। অশৌচ, রক্ষণশীলতা ধর্মকে অসুস্থ করে তুলেছে। মানব সেবার পরিবর্তে তখন একের দ্বারা অন্যে ধর্মের ভয় দেখিয়ে প্রতারণা ও বিভাজিত করে শোষণ করা হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ, জাতিভেদ, বর্ণভেদ ইত্যাদি। এই বিভেদ বা মানব জাতির মধ্যে বিভাজন কোন ধর্মের মূল লক্ষ্য হতে পারে না, তবে বাস্তবে তা হয়েছে, তার কারণ কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের দ্বারা ধর্মের অপব্যাখ্যা, যা মানববাণী তথা মানবতা থেকে বহু যোজন সরে গিয়ে ধর্মকে শুধুমাত্র একটি মতে পরিণত করেছে।

মানবতার পূজারী আম্বেদকর জীবনের একেবারে শেষ লগ্নে এসে ধর্ম পরিবর্তন করেন। আম্বেদকর বৌদ্ধধর্মের প্রগতিশীল এবং সংস্কারমুখী দিকটির প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন। তার উপলব্ধিতে বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ ধরা পড়েছিল এভাবে যে, বৌদ্ধধর্ম আসলে সহজ-সরল কিছু নীতি-নৈতিকতা, সত্য ও অহিংসা নীতির উপর গুরুত্ব প্রদর্শন এবং সেগুলকে মানবজাতির কল্যাণসাধক রূপে অনুষ্ঠেয় কতগুলি বিধান ছাড়া আর কিছুই নয়, যার মূল লক্ষ্য সকল মানুষকে এক ছত্রে বেঁধে দান, সেবা ও করুণার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা। আম্বেদকরকে অনুসরণ করে একথা বলাই যায় যে, বৌদ্ধধর্ম একদিকে যেমন মানবতাকে প্রতিবিম্বিত করে তেমনি বৌদ্ধধর্ম নিজেও মানবতার দ্বারা প্রতিবিম্বিত হয়। মূল্যবোধের এই অবক্ষয়ের যুগে বৌদ্ধধর্ম নির্বাসিত হয়েছে বলে মনে হতে পারে, কিংবা বর্তমান পরিস্থিতির জাঁতাকলে পরে কারও মনে হতেই পারে যে বুদ্ধ প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সম্ভব নয়। বুদ্ধদেব এক গভীর জীবনবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং ভালোবাসার দ্বারা মানব জাতিকে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ না করে, কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনে শৃঙ্খলিত না করে মানবতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব, তাই বিচার ও যুক্তির দ্বারা স্থিরনিশ্চিত না হয়ে তাঁর কোনও উপদেশ কে গ্রহণ করতে তিনি বারবার নিষেধ করেছেন। গৌতম বুদ্ধের কাছে শ্রদ্ধা অপেক্ষা যুক্তিই ছিল অধিক শক্তিশালী। তিনি মানুষ ছাড়া অন্যান্য সকল প্রাণীদের প্রতিও করুণা শিখিয়ে গেছেন, মানবিক হতে শিখিয়ে গেছেন। তাঁর শিক্ষার গভীরতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা এতটায় মর্মস্পর্শী যে সেই সুদূর অতীতকাল থেকে শুরু করে আজও তা অনুরণিত হয়ে চলেছে। এই দয়া, ক্ষমা, করুণাই হল গৌতম বুদ্ধের ধর্মের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যা আজও পৃথিবীর বুকে মানবতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ। মানবতার পূজারী আম্বেদকরও গৌতম বুদ্ধের উপলব্ধ সত্য শ্রদ্ধা অপেক্ষা যুক্তিই শ্রেষ্ঠ এই সত্যের উপর ভর করে মানব মুক্তি তথা মানবতার পথ প্রশস্ত করতে প্রয়াস করেছেন। জাত-পাত, বর্ণ ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে সাংবিধানিক স্তরে আইন প্রনয়ণের মাধ্যমে এক শ্রেণীহীন আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মানুষ হিসেবে সকলে সমান, মানবিকতা বা মানবধর্ম যে প্রকৃত ধর্ম সেই বার্তায় দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১। মানবতাবাদ, বসুধা চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা, ৩।

২। Seven Systems of Indian Philosophy, Pandit Rajmani Tiguanit, Page, 40.

৩। সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শন, স্বামী অভেদানন্দ, পৃষ্ঠা, ৮০।

৪। দর্শন জিজ্ঞাসা, শ্রীসুধির কুমার নন্দী, পৃষ্ঠা, ৮৫।

৫। Indian Philosophy, VOL. II, Jadunath Sinha, Page, 283-84.

৬। The Noble Eight Path, Bhikkhu Bodhi, Page, 14.

গ্রন্থপঞ্জি :

১। অভেদানন্দ, স্বামী, সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শন, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মঠ, কলকাতা, ১৯৯৮।

২। চক্রবর্তী, বসুধা, মানবতাবাদ, দীপায়ন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭।

৩। ধম্মপদ, চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক অনুবাদিত, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১০।

৪। নন্দী, শ্রীসুধির কুমার, দর্শন জিজ্ঞাসা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫।

৫। বাবা সাহেব ডঃ আম্বেদকর রচনা সম্ভার, দ্বাবিংশতি খণ্ড, সম্পাদনা, আশিষ সান্যাল, আম্বেদকর ফাউন্ডেশন, নতুন দিল্লি, ২০০০।

৬। বুদ্ধ এবং তার ধম্ম, আনুবাদক ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, জয়শ্রী প্রেস, কলকাতা, ২০০৪।

৭। Bodhi Bhikkhu, The Noble Eight Path, Mahabodhi Book Agency, Kolkata, 2012.

৮। Raju, P.T., The Philosophical Tradition of India, MLBD Publishers, Delhi,2009.

৯। Sinha, Jadunath, Indian Philosophy, VOL. II, Motilal Banarsidas Publishers, Delhi, Reprint, 2015.

১০। Tiguani, Pandit Rajmani, Seven Systems of Indian Philosophy, Himalayan Institute, 2011.